একটি ভনভনে মাছির কাছে করজোড়ে মিনতি

খন্দকার জাহিদ হাসান

একটি ভনভনে মাছি
আমাদের সিডনীর বাসাতে প্রায়ই ঢুকে পড়ে,
বদ্ধ ঘরে আটকা পড়ে প্রাণপণে উড়ে উড়ে
ভোঁ ভোঁ করে ঘুরে মরতে থাকে সেই মাছিটা,
মরতে মরতে আবার বেঁচে ওঠে ভনভনে মাছিটা,
ভনভন করে বলতে থাকে সে,
"আমি ঊনিশশ একাত্তর, আমি মহান মুক্তিযুদ্ধ, আমি স্বাধীন বাংলা-
এই চার দেয়ালের মাঝে আটকে থাকা আমার সাজে না মোটেও,
আমি স্বাধীনতার জ্বলন্ত নজির, আমি মুক্তির জীবন্ত প্রতীক।"

ঘরের দরোজাটা খুলে দিয়ে ঝাড়ি মারি আমি,
"যাও না বেরিয়ে বাবা মুক্তির জীবন্ত প্রতীক, যেদিকে খুশী যাও না চলে,
এমনকি ওজোন স্তরে ফুটো হয়ে যাওয়া অস্ট্রেলিয়ার সুনীল আকাশে
যেতেই পারো হয়ে তুমি আত্মহারা এক বিহ্বল বিহঙ্গ,
অথবা হাজারো ফুলের ঝাড়ে হতে পারো মৌলোভী এক মৌমাছি,
চাই কি আবার চোখ ধাঁধানো রূপের ভূবনে
হতেই পারো ভীমরতিগ্রস্থ এক ভীমরুল।"

অভিমানী কণ্ঠে ভনভন করে ওঠে মাছিটা,
"আমাকে এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছ কেন?
আমি কিন্তু হঠাৎ করে তোমার ঘরে ঢুকে পড়িনি,
আমি তোমার পুচ্ছ ধরেই এখানে এসেছি-
আমার আদি নিবাস বাংলাদেশ।"
প্রতিবাদে সোচ্চার হই আমি, "সব চাপাবাজী আর গুলগাপ্পা!
তুমি একটা বিরক্তিকর অস্ট্রেলিয়ান ভনভনে মাছি বই আর কিছুই নও,
এক্ষুণি বেরিয়ে যাও এই ঘর থেকে।"

ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মাছিটা, "তুমি হচ্ছ একটা বিংলিশ গর্ধভ!
তুমি না অস্ট্রেলিয়ান, না বাঙ্গালী!"
আমি ফ্লাই কিলিং স্প্রে হাতে মরিয়া হয়ে তাড়া করি মাছিটাকে,

আর চেঁচাতে থাকি, "তুমি বড্ড বাজে বকো হে ভনভনে উড়ন্ত কীট!
আমি জাতীয়তাবাদের নিকুচি করি,
আমি একজন বিশ্ব নাগরিক, গোটা পৃথিবীটাই আমার দেশ,
আমি একজন প্রগতিবাদী কবি।"

মাছিটা ভনভন করতেই থাকে, "বুল্ শিট্!
আসলে তুমি পলাতক, তুমি ছাইপাঁশ লিখো সব!"
মাছিটার মুখে অস্ট্রেলিয়ান স্ল্যাং শুনে চমকে উঠি,
সন্দেহ হতে থাকে তার আদি নিবাস আদৌ বাংলাদেশ কিনা,
সে কিন্তু আগের মতোই ভনভন করে চলে,
"ইউ স্টুপিড, তুমি কেবলি একটা পিন নাম্বার, কিংবা ক্লায়েন্ট নাম্বার,
তোমার রয়েছে অক্ষর ও সংখ্যাসমৃদ্ধ শুধুই একটা আইডি,
তোমার পাস্ ওয়ার্ড অহরহই ভুল হয়ে যায়,
আর বদলে যেতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে,
তুমি ঠিকমতো লগ ইন করতেও জানো না,
অথবা হয়তো জানো, কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না-
কারণ এটা তোমার মস্তিষ্কেই নেই যে,
কেবল দরোজা খুলে দিলেই আমি বেরিয়ে যেতে পারি না-
হ্যাঁ, আমি একটি ভনভনে মাছিই বটে,
তবে আমি এসেছি একাত্তরের সেই রক্তমাখা ডুরে শাড়ীটা থেকে,
যা দেখে বিজয় মিছিলে বেরিয়ে পড়া কিশোর তুমি আর তোমার বন্ধুরা
একদিন থমকে দাঁড়িয়েছিলে বেতার কেন্দ্রের পেছনের মাঠটিতে,
তোমাদের সব কটি চোখ
সেই শকুন্তলার মৃতদেহ খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সেদিন,
মাটিতে বিশাল প্রশ্নচিহ্নের মতো পড়ে থাকা রক্তমাখা শাড়ীটা
আরো অনেকদিন পড়ে ছিল সেখানেই, আমি তার সাক্ষী-
তারপর ধীরে ধীরে বরষার জলকাদায়
চলে যায় তা লোকচক্ষুর অন্তরালে।

আমি এসেছি বারনই নদীর জলে ভেসে যাওয়া
সেই মানুষগুলোর মৃতদেহ থেকে (মনে পড়ে কি তোমার?),
যারা শহীদ হয়েছিল দেশের জন্য।
একাত্তরে বাংলার শকুনেরা

হাজারো শকুন্তলার নগ্ন লাশ দেখতে দেখতে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে পড়ে,
একাত্তরে বাংলার শৃগালেরা
অফুরন্ত নরমাংস ভক্ষণ করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে-
আমি তার সাক্ষী, আর সাক্ষী চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র।"

এবার আমি জোর করে থামিয়ে দিলাম ভনভনে মাছিটাকে,
"আমাকে এসব বলে উতলা করার চেষ্টা কোরো না,
আসলে আমি আর উতলাই হই না,
কয়েক যুগ পূর্বেই কোনো এক ডাহুক-ডাকা সকালে
আমি আমার শৈশবের কাছে
চড়া সুদে পুঁটিধরা হাত-ছিপটি বন্ধক রেখে এসেছি,
অনেক কাল আগেই কোনো এক পেঁচাডাকা মধ্যরাত্রে
আমি আমার কৈশোরের কাছে
পানির দরে একাত্তরের সকল বীভৎস স্মৃতি বেচে দিয়েছি,
অতঃপর কয়েক দশক অতীতে কোনো এক মেঘডাকা বিকেলে
আমি আমার যৌবনের হাতে
নাম মাত্র মূল্যে আমার সকল প্রেমের কবিতা তুলে দিয়েছি-
আফসোস, এই মুহূর্তে বন্ধক দেয়া বা বেচে দেয়ার মতন
কোনো কিছুই আমার কাছে আর অবশিষ্ট নেই,
সুতরাং হে নাছোড়বান্দা বাংলাদেশী তথা আন্তর্জাতিক ক্ষুদে পতঙ্গ,
ভনভনে মাছিডাকা এই ভর সন্ধ্যায় তোমার কাছে করজোড়ে মিনতি-
ফিরে যাও তুমি তোমার মহান আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের কাজে,
হে নাছোড়বান্দা ভনভনে মাছি,
দেশে দেশে পরম আগ্রহে পাহারা দাও শহীদের অগণিত লাশ,
আগলে থাকো অসংখ্য ধর্ষিতা শকুন্তলার ছোপ ছোপ রক্তমাখা বসন-
তুমি ও তোমার আর সব সহযোগী চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র
সাক্ষী হয়ে অপেক্ষা করতে থাকো শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত-

এবারে আমাকে একটু রেহাই দাও,
বড় শ্রান্ত আমি, এই মুহূর্তে বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমার।